বিশ্ব খাদ্যহীন দিবস ২০১২

উন্নয়ন প্রকল্প বা আবাসন শিল্পের নামে কৃষি জমি দখল বন্ধ কর

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যেকোনও মূল্যে কৃষি জমি রক্ষা করতে হবে

১৬ অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস। প্রতিবছরের মতো এবারও বিশ্ব খাদ্য সংস্থার উদ্যোগে বা পরামর্শে বিশ্বের প্রায় সব কয়টি দেশেই এই দিবসটি পালিত হচ্ছে। বিশ্ব খাদ্য দিবসের মূল লক্ষ্য হলো ক্ষুধা দূরীকরণের লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা। বিশ্ব খাদ্য দিবসকে উপলক্ষ করে, বিশ্বের ক্ষুধার্ত মানুষের কথাগুলো সবাইকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নাগরিক সমাজ সংগঠন **বিশ্ব খাদ্যহীন দিবস** পালন করছে।

নানা উদ্যোগ সত্ত্বেও বিশ্ব জুড়ে ক্ষুধার্ত ও অপুষ্ট মানুষের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। সারা বিশ্বে বর্তমানে ৯২৫ মিলিয়ন মানুষ ক্ষুধা ও অপুষ্টির শিকার। শুধু এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশে ক্ষুধার্ত ও অপুষ্ট মানুষের সংখ্যা প্রায় ৫৭৮ মিলিয়ন।

১৬ অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য সংস্থা বিশ্ব খাদ্য দিবস পালন করছে, এ মাসেই সংস্থাটির খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটি তাদের ৩৯তম আলোচনা সভায় মিলিত হবে। আশংকা করা হচ্ছে যে, এবারেও তারা ক্ষুধা ও অপুষ্টি নিয়ে আলোচনা করবেন এগুলোর অন্যতম কারণকে বিবেচনা না করেই। এই কারণটি হলো উৎপাদনের উৎসের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ভূমিতে দরিদ্র মানুষের সীমিত প্রবেশাধিকার। অবশ্য এফএও'র ক্ষুধা দূরীকরণের পদ্ধতি নব্য উদারতাবাদী দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের নামে কৃষিতে উগ্র বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে। আর এতে করে ক্ষুদ্র কৃষককে ক্ষুধা আর অপুষ্টি নিয়ে জীবন যাপন করতে হয়, এক পর্যায়ে হয়ত তাকে তার ভিটেমাটি থেকেই উচ্ছেদ হতে হয়। কৃষি ক্ষেত্রে বিশ্ব জুড়ে এখন পর্যন্ত প্রায় ৪০০ বড় আকারের বিনিয়োগের খবর পাওয়া যায়, যার ফলে প্রায় ৩৫ মিলিয়ন হেক্টর কৃষি জমি দখল হয়ে গেছে।

উন্নয়ন, বিনিয়োগ প্রভৃতি নানা নামে কৃষি জমি দখল হয়ে যাওয়ার এই প্রবণতা খাদ্য নিরাপত্তার প্রতি অনিবার্য হুমকি তৈরি করছে।

বাংলাদেশের কৃষি তথা কৃষি জমির উপর খাদ্য নিরাপত্তা ব্যাপকভাবে সম্পর্কিত। দেশের কৃষি জমি প্রতিবছর ১% হারে কমে যাচ্ছে। নানা অজুহাতে দখল হয়ে যাচ্ছে ব্যাপক পরিমাণ জমি। এসব কারণ দেশের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতাকে উসকে দিচ্ছে। এরকম একটি প্রেক্ষাপটে প্রধানত দুটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিশ্ব খাদ্যহীন দিবস পালন করা হচ্ছে:

১. খাদ্য নিরাপত্তার উপর ভূমি দখলের প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা তৈরি, এবং
২. খাদ্য সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ভূমি দখলের বিরুদ্ধে দাবি তুলে ধরা

বর্তমান প্রবৃদ্ধির হার ৬.৩% এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ ভালো করলেও এখনও দেশটির ৩২% মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে, ৪০% মানুষ দৈনিক প্রয়োজনীয় খাবারের তুলনায় কম খাবার পায় *(বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১০)*, ২৬% মানুষ নিয়মিত খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার শিকার, দেশের প্রায় ৫ কোটি লোক খাদ্য ও অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে পারে না *(এফএও, ২০১১)*। প্রায় ৪ কোটি ৭০ লাখ দরিদ্র মানুষের মধ্যে ২ কোটি ২৬ লাখই অতি দরিদ্র *(পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১০)*।

ভূমি, তথা কৃষি জমির অসম বণ্টন খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টির একটি অন্যতম কারণ। গবেষণায় দেখা গেছে, জমির মালিকানা বা ভোগ দখলের সঙ্গে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি কার্যকরিভাবে সম্পর্কযুক্ত। যার মালিকানায় যত জমি আছে তার দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ততই নিরাপদ। ভূমিহীন মানুষ গড়ে প্রতিদিন ২১৯৪ কিলো ক্যালরি খাবার খায়, যা কিনা অতিদরিদ্র মানুষের খাবার গ্রহণের প্রায় সমান (২১২২)। অন্যদিকে ভূমিহীনরা ভূমির মালিকদের তুলনায় প্রায় ২.৩ গুণ কম স্বাস্থ্য সেবা পায়, ৪.৭ গুণ কম শিক্ষার সুযোগ পায়। ভূমি আছে এমন নারীদের তুলনায় ৩৬.৯% ভূমিহীন নারী সাক্ষরতা সম্পন্ন, পুরুষদের মধ্যে এই পার্থক্য ২৪.৮% *(ল্যান্ড ওয়াচ এশিয়া)*।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, ভূমির মালিকানা বা ভোগের সঙ্গে খাদ্য নিরাপত্তার একটি যোগসূত্র আছে। দেশের ভূমির মালিকানা পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে সেখানে চরম অসম বণ্টনের চিত্র পাওয়া যায়। দেশের ৮৯% লোক ১ হেক্টরেরও কম জমির মালিক, ৩৯% লোক ০.২ হেক্টরের মতো জমির মালিক *(ইউএসএআইডি ২০১০)*। ভূমিহীনের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বণ্টনসহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা কার্যকর হচ্ছে না। জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণকারী ১৯৫০ সালের আইন (সর্বোচ্চ ৩৩ একর) ও ১৯৮৪ সালের আইন (সর্বোচ্চ ২২ একর) তেমনভাবে কার্যকর নয় বললেই চলে।

১৯৬০ সালে দেশের ১০% পরিবার মোট ৩৭% জমির মালিক ছিল, ১৯৯৬ সালে এসে দেখা যায় ২.১% লোক দেশের মোট কৃষি জমির ১৭.৩%-এর মালিক। দেশের ৭০% পরিবারের মালিকানায় ছিল মাত্র ১৫% কৃষি জমি। একই সঙ্গে ১৯৬০ সালে ভূমিহীনের সংখ্যা যেখানে ছিল ১৯%, ১৯৯৬ সালে তা এসে দাঁড়ায় ৫৬%-এ *(ল্যান্ডওয়াচ এশিয়া)*! এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে, কৃষি জমির মালিকানা একদিকে যেমন গুটিকয়েকজনের হাতে সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, তেমনি বাড়ছে ভূমিহীনের সংখ্যা। আর এর অনিবার্য ফল হিসেবে বাড়ছে খাদ্য নিরাপত্তাহীন মানুষের সংখ্যা।

ভূমিহীন বা খাদ্য নিরাপত্তাহীন মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া বা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা সংকীর্ণ হয়ে পড়ার অনেকগুলো কারণের কয়েকটি কারণ হলো কৃষি জমির বেদখল, জবর দখল ও অপব্যবহার। কৃষি জমির বেদখল বা জবর দখল হয়ে যাওয়ার একটি উদাহরণ হতে পারে দেশের খাস জমি বণ্টনের পরিসংখ্যান। গবেষণায় দেখা গেছে যে, মাত্র ১১.৫% খাস জমি সঠিক মানুষের মধ্যে, অর্থাৎ গরিব ও ভূমিহীনদের মধ্যে বরাদ্দ করা হয়েছে, আর বাকি ৮৮.৫% খাস জমিই প্রভাবশালীরা নামে-বেনামে জবর দখল করেছে *(ড. আবুল বারাকাত, ২০০৪)*।

ধনী ও প্রভাবশালী মহল নানাভাবে জমি দখল করে চলছে। ভুয়া দলিলপত্র, আদালতকে প্রভাবিত করা এবং অনেক সময় প্রশাসনের লোকজনকে হাত করে জমি দখল করে নেওয়া হচ্ছে। ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভূমি প্রতিমন্ত্রী সংসদে জানিয়েছিলেন যে, ১.৩ মিলিয়ন একর সরকারি জমি জবর দখল করে নেওয়া হয়েছে। দখল করে নেওয়া ভূমির খুব কম অংশই কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয়। আবাসন ব্যবসা বা শিল্প

প্রতিষ্ঠান তৈরির জন্যই এসব ভূমি ব্যবহৃত হয়, যা কৃষি উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

কৃষি জমি দখলের ক্ষেত্রে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেরও যোগসাজশ পরিলক্ষিত হয়। সরকারি বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ, অথবা বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভূমি দখলের ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদ প্রায় স্পষ্ট। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর নিস্ক্রিয়তার কারণে দেশের চরএলাকাসহ বিভিন্ন এলাকার প্রচুর জমি প্রভাবশালীরা দখল করে ফেলায় চর এলাকাসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষজনকে স্থানত্যাগ করতে বাধ্য হতে হচ্ছে, যা তাদের জীবন জীবিকার প্রতি হুমকি তৈরি করছে।

কৃষি জমির বাণিজ্যীকীকরণের কারণে গত চার দশকে দেশে প্রতিদিন প্রায় ৫৯৬ বিঘা বা প্রায় ১৯৭ একর আবাদি জমি হারিয়ে গেছে। ১৯৭২ সালে গ্রাম-প্রতি গড়ে যেখানে আবাদি জমির পরিমাণ ছিল ১৬০ একর, সেটি ২০০৯ সালে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪৩.৩ একরে। ১৯৭২ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৬ লাখ ৬৭ হাজার একর কৃষি জমি অকৃষি জমিতে পরিণত হয়েছে। যার ফলে গত চার দশকে প্রতি বছর প্রায় ৪৪ হাজার কৃষক তার পেশা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে, এবং গত দুই দশকে প্রতি বছর প্রায় ১ লাখ ৫৫ হাজার জেলে তার পেশা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে *(ড. আবুল বারাকাত, ২০১১)*। বাণিজ্যের নামে কৃষি জমি দখলের বিরূপ প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে এই পরিসংখ্যান তার জ্যান্ত প্রমাণ।

বাংলাদেশে ভূমি দখলকারীদের শ্রেণী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নব্য ধনী, সামরিক-বেসামরিক আমলা, রাজনৈতিক নেতারাই এই দখলদারিত্বের পুরোধা। আশির দশকে নব্য উদারতাবাদী অর্থনীতি, বিশেষ করে '৮২ সালের নতুন শিল্প নীতি উপরোক্ত শ্রেণীটিকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে, ফলে তারা সেগুলোর ব্যবহারের মাধ্যমে সহজেই বিভিন্ন অজুহাতে ব্যাপক ভূমি দখলে সক্ষম হয়। অন্যদিকে শিল্পের বেসরকারিকরণ ও কৃষি ক্ষেত্রে ভর্তুকি কমতে থাকার ফলে গরিবের কাছে,কৃষকের পক্ষে ভূমির দখল রাখার সুযোগ সীমিত হয়ে যায়।

আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বসত বাড়ি নির্মাণের কারণে অনেক কৃষি জমি হারিয়ে যাচ্ছে। একটি গবেষণা বলছে ২০২৫ সালের মধ্যে দেশের মোট ভূমির ৫০% শুধু মানুষের বসতির জন্য ব্যবহৃত হবে *(সমতা, ২০০৬)*।

ভূমি দখলের ফলে জেলে সম্প্রদায়ের খাদ্য নিরাপত্তাও দিনের পর দিন হুমকির মধ্যে পড়ছে। মৎস্য আহরণের প্রাকৃতিক জলাভূমিগুলো ধনী ও প্রভাবশালীদের মধ্যে ইজারা দিয়ে দেওয়ার ফলে সাধারণ জেলেদের আয় রোজগারে তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। আবার চিংড়ি চাষের জন্য কৃষি জমির বাণিজ্যিক ব্যবহার বাড়তে থাকায় দেশের দক্ষিণাঞ্চলে কৃষি জমি কমে যাচ্ছে। প্রচুর কৃষি জমি দখল করে তৈরি করা হচ্ছে লাভজনক চিংড়ি ঘের।

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের ফলে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে আছে। বিশেষজ্ঞরা হিসাব করে দেখাচ্ছেন যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশের কৃষি উৎপাদন হ্রাস পেয়ে যাবে, ধান ও গম উৎপাদনে ব্যাপক বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় উপকূলীয় এলাকার কৃষিতে বিপর্যয় নেমে আসবে, অন্যদিকে অনিয়মিত বৃষ্টিপাত বা অনাবৃষ্টির কারণে উত্তরাঞ্চলের স্বাভাবিক কৃষি উৎপাদনও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো কঠিন হয়ে যাচ্ছে, ফলে খাদ্য আমদানি নির্ভরতা আরও বাড়বে। খাদ্য আমদানির হার দিন দিন বেড়েই চলছে। ১৯৮৫-৮৬ অর্থবছরে মোট ১১৩ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য আমদানি করতে হয় (সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল আরও প্রায় ১০৮৭ হাজার মেট্রিক টন)। ২০১০-১১ অর্থবছরে আমদানি করতে হয়েছে ৫১৫০ হাজার মেট্রিক টন, আর সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল মাত্র ১৬২.৭ হাজার মেট্রিক টন। পরের বছর, অর্থাৎ ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমদানি করতে হয়েছে ১৮১৮ হাজার মেট্রিক টন, সাহায্য পাওয়া গেছে মাত্র ৪৮.৩ হাজার মেট্রিক টন। অর্থাৎ আমদানিনির্ভরতা বাড়ছে ব্যাপকভাবে, অন্যদিকে খাদ্য সাহায্য কমছে *(অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২)*। বিশ্ব খাদ্য উৎপাদনের বর্তমান প্রবণতা এই আশংকা তৈরি করে যে, ভবিষ্যতে টাকা দিয়েও প্রয়োজনীয় খাবার যোগানো কঠিন হয়ে যাবে।

সুতরাং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে অনতিবিলম্বে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার কোন বিকল্প নেই। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিশ্চিত করতে কৃষি জমির সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে, জমির বেদখল বন্ধ করতে হবে, কৃষি জমির অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহারের উপর কড়াকড়ি আরোপ করতে হবে, ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে, স্থায়িত্বশীল কৃষি নিশ্চিত করতে হবে, বিদেশি ক্ষতিকর প্রযুক্তি যেমন হাইব্রিড, জিএমও ইত্যাদির উপর নির্ভরতা কমাতে হবে কারণ এগুলো বিদেশি কোম্পানির উপর নির্ভরতা বাড়িয়ে দেয়। তবে সবার আগে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি কার্যকর ভূমি সংস্কার নিশ্চিত করতে হবে।

সংগঠনসমূহ:

অর্পন, এসো, অনলাইন নলেজ সোসাইটি, ইক্যুইটিবিডি, ভয়েস, বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, ডিসিআই, এসডিও, সেল্ফ ডেভেলপমেন্ট, মানুষ মানুষের জন্য, সিডিপি, কৃষাণী সভা, ইউনাইটেড পিপল ট্রাস্ট, সুরক্ষা ও অগ্রগতি ফাউন্ডেশন, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট

সচিবালয়:

ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ১৩/৩, রোড়: ২, শ্যামলী, ১২০৭। ফোন: ০২ ৮১২৫১৮১/৮১৫৪৬৭৩, ই মেইল: info@equitybd.org, ওয়েব: www.equitybd.org

যোগাযোগ:

মো. মজিবুল হক মনির, *মোবাইল: ০১৭১৩৩৬৭৪৩৮, ইমেইল: munir@coastbd.org*

রেজাউল করিম চৌধুরি, *মোবাইল: ০১৭১১৫২৯৭৯২, ইমেইল: reza@coastbd.org*